আনন্দবাজার পত্রিকা , বর্ধমান সংস্করণ, ৮ মার্চ, ২০২০

মেয়েগুলোকে কী ভাবে বাঁচাব বলতে পারেন!

গোপা সামন্ত

বাড়ির অবস্থা ফিরলে মেয়েদের অবস্থা ফেরে এমন নিশ্চয়তা নেই। ভূমিহীন কৃষক জমির মালিক হলে বাড়ির মেয়ের বাইরের কাজ বন্ধ হয়। কারণ, বাড়ির সম্মান রক্ষার দায় এসে পড়ে তাঁর ঘাড়ে। মেয়েরা কাজে যোগ দিলে তা-ও পরিবারের সম্মানের সঙ্গে মানানসই হওয়া চাই। তাই মেয়েরা চাইলেই যে কোনও কাজে যোগ দিতে পারেন না।

পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে চাষের কাজেও হাত লাগিয়েছেন মহিলারা। নিজস্ব চিত্র

পঞ্চাশ বছর আগে গ্রামের বাড়ির মড়াইতলায় যখন জন্মেছিলাম, ধাই-মা আমাকে তুলতে চাননি। কারণ, আমি কন্যা সন্তান। দাদু ছিলেন তুলনামুলক উদার। ধাই-মাকে বলেছিলেন ‘নাতনিকে আমি মানুষ করব, তোমার কী? ওকে তোলো’। মায়ের কাছে শুনেছি সে কথা।

আজ পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে, স্বাস্থ্যকর্মীদের আলোচনায় উঠে আসে —আশাকর্মী হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রসব করানোর ব্যবস্থা করায় কোনও বধূ হয়েছেন পরিত্যক্ত। কেউ আবার কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় হাসপাতাল থেকে

শ্বশুরবাড়িতে আর ফিরে আসতে পারেননি, তাঁকে বাকি জীবন কাটাতে হবে বাপের বাড়িতে। কন্যাভ্রূণ হত্যার খবর সকলেই জানি। কিন্তু গলা টিপে কন্যাসন্তানকে খুন করাটাও না কি অব্যাহত আছে কোথাও কোথাও। শুনতে শুনতে কেবলই মনে হয়, দেশ তো এগোচ্ছে কিন্তু এখনও মেয়েদের অবস্থা তেমন বদলাচ্ছে না কেন?

অবশ্য দেশের সঙ্গে মেয়েদের অবস্থা ভারতে কোনও দিনই তেমন বদলায়নি। তা যদি হত, তা হলে স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরে 'towards equality' রিপোর্ট তৈরির দরকার হত না। বাড়ির অবস্থা ফিরলে মেয়েদের অবস্থা ফেরে এমন নিশ্চয়তা নেই। ভূমিহীন কৃষক জমির মালিক হলে বাড়ির মেয়ের বাইরের কাজ বন্ধ হয়। কারণ, বাড়ির সম্মান রক্ষার দায় এসে পড়ে তাঁর ঘাড়ে। মেয়েরা কাজে যোগ দিলে তা-ও পরিবারের সম্মানের সঙ্গে মানানসই হওয়া চাই। তাই মেয়েরা চাইলেই যে কোনও কাজে যোগ দিতে পারেন না।

আসলে ভারতবর্ষ দেশটার মধ্যে অনেক ভারতবর্ষ আছে। যে ভারতবর্ষের খবর আমরা নাগরিক মধ্যবিত্ত তেমন রাখি না। আর সে অনালোকিত ভারতবর্ষের মেয়েদের অবস্থার কথা জানতে গেলে আমদের দরকার হয় 'প্রতীচী'র আলোচনাচক্রের, যেখানে আসেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। তাঁদের কথা শুনতে শুনতে আমরা আঁচ পাই ভারতবর্ষের মেয়েদের চালচিত্রের। ঝাঁ চকচকে ভারতের স্বনির্ভর মেয়েদের আলোর পিছনের ছায়াতে পড়ে থাকা মেয়েদের কথা। এ বারের অনুষ্ঠান ছিল নবনীতা দেব সেন স্মরণে। তাই আরও বেশি করে চলে আসে মেয়েদের কথা। এখানে সবাই সেই সমস্যাগুলো তুলে আনেন যা তাঁরা নিত্যদিন দেখেন। মেয়েদের নিয়ে কথা বলার তেমন পরিসরই বা কোথায়—পরিবারে, সমাজে বা রাষ্ট্রের কাছে? নারীদিবস ছাড়া? অনেকে প্রশ্নই রাখেন বেশি। প্রতিটি প্রশ্নের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে অনেক তথ্য।

মুর্শিদাবাদ জেলার জিনত দিদিমণির প্রশ্ন থামতেই চায় না। এত মেয়ে স্কুলে যায়, কিন্তু তারা যায় কোথায়? স্কুলে কম্পিউটার শেখানো হয়, মেয়েদের 'মার্শাল আর্ট' শেখানো হয় না কেন, তা হলে কয়েকটা মেয়ে হয়তো বা ধর্ষণ কিংবা মৃত্যুর হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারত? স্কুলে বই, ব্যাগ, জুতো বিনামূল্যে পাওয়া যায়, স্যানিটারি ন্যাপকিন বিনামূল্যে পাওয়া যায় না কেন? ঠিক কী করলে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের টাকা আর 'সবুজসাথী'র সাইকেল মেয়েরা দখল করতে পারবে? লেখাপড়া করেও মেয়েরা কি বিড়িই বাঁধবে? তা হলে লেখাপড়ার দরকার কি? মেয়েদের গয়না, এটিএম কার্ড সব শ্বশুরবাড়ির লোকে নিয়ে নিলে, মেয়েরা কোথায় নালিশ জানাবে? মেয়েগুলোকে কী ভাবে বাঁচাব বলতে পারেন?

এমন প্রশ্নের সামনাসামনি হওয়া বেশ অস্বস্তির। সাজানো ভারতবর্ষের চকচকে বেলুনে ফুটো করতে থাকে প্রতিটি প্রশ্ন। শুনতে শুনতে মনে হয়, দিদিমণি যত সহজে প্রশ্নগুলো তুলে আনতে পারেন, উত্তরগুলো কিন্তু অত সহজে পাওয়ার নয়। সেখানে জড়িয়ে আছে তিনটি প্রধান প্রতিষ্ঠান—পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। সকলে মিলেই যেন চেষ্টা করে মেয়েদের যাতে বেশি বাড় না বাড়ে।

আর এক দিদিমণি কাঁদতে কাঁদতে বর্ণনা দিতে থাকেন তাঁর এক প্রিয় বুদ্ধিমতী ছাত্রীর বাড় কী ভাবে কমিয়েছিল পাড়ার রোমিও। ছেলেটির প্রেমের প্রস্তাবে মেয়েটি সাড়া দিচ্ছিল না। কারণ, সে তখন স্বপ্নে বিভোর যে পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে।

এক দিন ফাঁকা দেখে সুযোগ বুঝে রোমিও এল ঘরে। ধর্ষিত বা খুন— হয়নি মেয়েটি। তার প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক বানিয়ে এনেছিল একটি চশমা। কাঠের ফ্রেম আর তাতে পেরেক পোঁতা। অভিযোগ, মেয়েটিকে জোর করে সেই চশমাটি পরিয়ে দেওয়া হয় চোখে পেরেক ঠুকে। জন্মের মতো অন্ধ হয়ে যায় মেয়েটি। পড়াশোনা করে বাড়তে চেয়েছিল, তার 'শাস্তি'। যাঁরা ভাবি, মেয়েদের উপরে অত্যাচার মানে হল মারধর, ধর্ষণ, খুন, অ্যাসিডে পোড়ানো— তাঁদের এই মানুষগুলি বুঝিয়ে দেন, তোমরা ভারতবর্ষের মেয়েদের খবরই রাখ না।

সরকার চায়, রিপোর্ট-কার্ডে থাকবে সব ভাল-ভাল তথ্য। থাকবে না মেয়েদের কষ্টের বা অত্যাচারের কথা। 'হিমোগ্লোবিন কিট' না থাকার জন্য যদি ঠিক সময়ে রক্ত পরীক্ষা না হওয়ার ফলে প্রসূতির মৃত্যু হয় রাষ্ট্র দোষটি চাপিয়ে দিতেই পারে আশা বা এএনএম কর্মীর ঘাড়ে। পড়াশোনায় ভাল মেয়ে হঠাৎ নিখোঁজ হলে প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকার হাজার চেষ্টাতেও থানা ডায়েরি নিতে চায় না, মেয়েটির ফোন পেয়ে তাকে উদ্ধারের জন্য আবেদন করলেও পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে—এমন অভিযোগ আকছার ওঠে। সরকার কেন চাইবে রিপোর্ট-কার্ড খারাপ করতে, তা সে যে যেখানেই ক্ষমতায় থাকুন না কেন!

সব সরকারই তাদের মতো করে মেয়েদের জন্য নানা প্রকল্প করে। তবে সমাজ ও পরিবার নামের জগদ্দল পাথর বাঁচিয়ে। আর সেখানেই প্রশ্ন তোলেন আর এক দিদিমণি—''রাষ্ট্র যদি সমাজ ও পরিবার নামের প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটুও আঘাত না করে, বরং, তাদের মেয়েদের উপরে অত্যাচার চালিয়ে যেতে সাহায্য করে তা হলে মেয়েরাই বা যাবে কোথায়? তাদের বাঁচাব কী ভাবে?" জবাব জানা নেই। প্রশ্ন আছে। এই একবিংশ শতকে দাঁড়িয়েও আশাপূর্ণা দেবীর সত্যবতীর মতো কি বলতে থাকব— ''মেয়েদের যদি কিছুতেই অধিকার না থাকে তাদের জন্মানোর দরকার কি ছিল?''

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল শিক্ষক

আনন্দবাজার পত্রিকা, মুর্শিদাবাদ সংস্করণ, ৮ মার্চ, ২০২০

অর্ধেক আকাশের স্বপ্নটা সর্বদাই ভগ্নাংশে ধরা পড়ে

মুর্শিদা খাতুন

নদিয়ার এক শিক্ষক মেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্যের কথা বলেন প্রতীচি ট্রাস্টের আলোচনা সভায়।
জানান, অবদমনের ফলে মেয়েদের যে মানসিক জটিলতা তৈরি হয়, স্কুল স্তর থেকেই তার যত্ন নেওয়া যায়।

—ফাইল চিত্র।

আমরা মেয়েদের অর্ধেক আকাশ বলে গৌরবান্বিত করি। আমাদের গোটা আকাশের স্বপ্নটা সর্বদাই ভগ্নাংশে ধরা পড়ে। তাই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্‌কালে একটি গোটা দিবস উপহার পেয়ে আমরা আহ্লাদিত হই। আলোচনা, বিতর্ক, সান্ধ্যকালীন চর্চা, নাচ-গান-আবৃত্তির সঙ্গে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন, নিউ ইয়র্কের নাম না জানা সুতা শ্রমিকদের কথা এলেও শোনা হয় না আমার বাড়ির মেয়েটির কথা বা আমাদের গ্রামেগঞ্জে ধুঁকতে থাকা সাধারণ মহিলাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি। শোনা হয় না ক্লাসে বসে থাকা শুকনো মেয়েদের মনের কথা।

সারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৭.৫% আমার ভারতের বাসিন্দা। অর্থাৎ, ১২১ কোটির প্রায় অর্ধেক অবলা। ২০১১ সালের জনগণনার রিপোর্ট আজকের ভারতীয় নারীদের নাড়িনক্ষত্রের তথ্য পাওয়া যাবে— শিক্ষার হার, নারীপুরুষ অনুপাত, কন্যাভ্রূণ হত্যার হার, প্রসূতিমৃত্যুর হার-সহ নারীশ্রমের করুণ চিত্রও আজকাল ইন্টারনেটের দৌলতে

সহজলভ্য। কিন্তু কেউ খোঁজ রাখে না সত্যি সত্যি তারা আছে কেমন। কেউ কি তাদের শরীরের কথা ভাবে? কেউ কি তার মনের হদিস করে?

এমন মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল প্রতীচী ট্রাস্টের একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানে। নবনীতা দেবসেনের স্মরণে আলোচিত বিষয়— 'ভারতের মেয়েরা: আজকের চালচিত্র, আজকের করণীয়'। দেশবিদেশের গুণিজনের উপস্থিতিতে দু'দিন ধরে আলোচনা করলেন। ছিলেন বাংলার বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম, বর্ডার এলাকা, দ্বীপ অঞ্চল বা আধা শহর ও শহর থেকে আসা প্রাথমিক শিক্ষক, সেকেন্ডারি শিক্ষক, কলেজ শিক্ষক, সাংবাদিক, আশাকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী থেকে শুরু করে সমাজকর্মী ও কিশোরী ছাত্রী। প্রায় সকল স্তর থেকে আসা প্রতিনিধিবৃন্দ, যাঁরা একেবারে নীচের স্তরে মা ও মেয়েদের সঙ্গে কাজ করছেন। আলোচনা শুনতে শুনতে সকলের চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। একাধারে মায়েদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি-সহ রোজকার জীবনযন্ত্রণার কথা, অন্য দিকে, কিশোরী মেয়েদের নিজের মুখে নিজের কথা অপকটে বলা ও শোনার একটা চমৎকার প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়। যাতে সহজেই গ্রামগঞ্জ, মফস্সলে আজকের মেয়েদের ভয়াবহ অবস্থাটা প্রকট হয়ে ওঠে।

প্রথম দিনে সমগ্র আলোচনাটি দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়— শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। বিদ্যালয় শিক্ষকগণ আলোচনায় আনেন বর্ডার এলাকায় মেয়েদের জীবনের ভয়াবহতা। সেখানে মেয়েদের এক দিকে অভাব অনটন অপুষ্টি, হিংসা, অন্য দিকে পাচার। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো রয়েছে বিএসএফ তাদের রোজকার মনোরঞ্জনের জন্য কাঠপুত্তলির মতো দশা। দিনাজপুরের এক প্রতিনিধি শিক্ষক আলোচনা করেন ছোট-বড় সব মেয়ের যৌনহেনস্থার মর্মান্তিক দিক সেখান থেকে উত্তরণের দিশা কী? আধা মফস্সল শহরে থাকা এক দিদিমনি তুলে ধরেন মেয়েদের নিজেদের নিকট আত্মীয়দের দ্বারাই কী ভাবে অত্যাচারিত হতে হয় অনেককে। নিজের বাড়িটাও হয়তো মেয়েদের জন্য নিরাপদ হয় না। কাজের জায়গায় যৌনহেনস্থা বহু চর্চিত হলেও এ বিষয় অনাবৃত্ত থেকে গিয়েছে। হিঙ্গলগঞ্জের দ্বীপ এলাকায় কাজ করা মেয়েরা কেমন আছে, সে কথা উঠে আসে সেখানকার এক প্রধানশিক্ষকের বয়ানে। হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে হতদরিদ্র পরিবারগুলো সুন্দরবন এলাকায় কী ভয়ঙ্কর জীবন কাটায়, সেও তাঁর বয়ানে ফুটে ওঠে। শিশু পাচার, অভাব শরিফা খাতুনদের কেমন ভাবে বদলে দেয়, মেয়েদের ফুটবল খেলা থেকে স্বনির্ভরতার পাঠ আমাদের মেয়েদের উত্তরণের দিশা দেখায়। নদিয়ার এক শিক্ষক সুন্দর ভাবে মেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্যের কথা বলেন। অবদমনের ও অত্যাচারের ফলে মেয়েদের যে মানসিক জটিলতা তৈরি হয়, তার যে স্কুল স্তর থেকেই যত্ন নেওয়া যায়, সে দিশা পাওয়া যায় আলোচনায়। 'মনের খাতা' নামে এক সুন্দর খাতার কথা বলেন তিনি। সেখানে নাম না লিখে নিজের মনের অবস্থা, কষ্ট জানানোর সুন্দর পন্থার কথা বলেন। কোচবিহার থেকে আসা মাস্টারমশাই তুলে আনেন রজঃস্বলা মেয়েদের অবৈজ্ঞানিক ধর্মীয় বিধি নিষেধ ও গোঁড়ামির কথা। তিনি সুন্দর করে বলেন— সতী বা মুখরা শব্দগুলোর কোনও পুংলিঙ্গ নেই। আর মা হল যোনির প্রতীক, তাই মাকে উদ্দেশ্য করে গালাগাল দিলে সকলে ক্ষিপ্ত হয় কারণ মায়ের যোনির অপমান করা হয়।

এক স্বাস্থ্যকর্মী জানান, আজও আমাদের প্রসূতি বা গর্ভবতী মায়ের তার বাড়ির কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি যদি তার এরিয়াভুক্ত না হয়, তা হলে সেখানে তার পরিষেবা পাবে না। তার কেন্দ্রটি দূরে হলে সেই দূরবর্তী কেন্দ্রে গিয়ে পরিষেবা নেওয়ার আজব নীতি আমাদের রাজ্যে চালু আছে। এক সাংবাদিকের বয়ানে উঠে আসে রাজস্থানের এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর কথা, যিনি আজও ভোর হতে না হতে চার কিমি দূরের কুয়ো থেকে পায়ে হেঁটে জল তুলে

আনেন বেশ কয়েক বার। তার পর ছেলেমেয়ে সামলে যান অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। সেখান থেকে ফিরে তিনি বয়স্কদের নিয়ে রাতে একটা স্কুল চালান। এ যেন আমাদের দশভূজা! মুসলমান মেয়েদের কথাও আলোচিত হয়। গ্রামীণ মুসলিম মেয়েদের বাল্যবিবাহ, অশিক্ষা, অপুষ্টি, অভাবে জর্জরিত আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার একটাই উপায়— আর্থিক স্বনির্ভরতা। এ ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মেয়েদের উল্লেখ জরুরি। বিশেষ করে, পরিচারিকা, আনাজবিক্রেতা, ইটভাটার শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক-সহ যাঁরা বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে জীবনসংগ্রামে সরাসরি যুতে রয়েছেন, তাঁদের তেজ ও আত্মবিশ্বাস অনুকরণীয়।

সব চেয়ে চমকপ্রদ ছিল, ছাত্রীদের অপকটে নিজেদের কথা আলোচনা করার সুযোগ। বিভিন্ন স্তর থেকে আসা ছাত্রী, যেমন হিন্দু, মুসলিম, সাঁওতাল, অনগ্রসর শ্রেণি, উপজাতি প্রভৃতি। তাঁদের আলোচনা সকল দর্শককে এক বিষাদ অশ্রুসজল দুনিয়ার সন্ধান দেয়। মনে করা যাক সেই মেয়েটির নাম আশা খাতুন। সে যখন তার মায়ের উপর ঘটে চলা রোজকার অত্যাচারের কাহিনি বলতে বলতে ভেঙে পড়ে, তখন সকলে যন্ত্রনায় কুঁকড়ে যায়। আর এক ছাত্রী হাসিনা খাতুন বলে তার দিদির কথা, যে মেয়ে আইএএস হতে চেয়েছিল। শেষপর্যন্ত বাল্যবিবাহের শিকার হয়ে সে আত্নহননের পথ বেছে নেয়। আর এক ছাত্রী তার নিজের বিপথে গমন থেকে সেখান থেকে উত্তরণের কথা বলে। আদিবাসী পরিবারে মেয়েরা কেমন আছে, তারা কী চায়, সে বিষয়ে সোনামনি হাঁসদা বলে। বলেন কী ভাবে তারা নিজের মাতৃভাষা সাঁওতালিতে পড়ার কোনও সুযোগ পায় না। বলে তাদের পরিবারে ছেলেমেয়ের ভেদাভেদ নিয়ে। একটি মেয়ের যখন স্কুলের আঙিনায় থাকার কথা, তখন তাকে পরিবারের চাপে মাঠে দিনমজুরির কাজে যেতে বাধ্য করা হয়। পিঙ্কি রায়দের কথায় উঠে আসে রাস্তাঘাটে কী ভাবে তাদের নিরাপত্তার অভাব হয়। কুকথা, অশ্লীল ইঙ্গিত তাদের রোজকার জীবনকে নরক বানায়।

পঞ্চায়েতের সেই মহিলা প্রধানের কথা বলাও প্রয়োজন। আমাদের রাজ্যে সংরক্ষণের দৌলতে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে প্রচুর মহিলা প্রতিনিধির দেখা মেলে, যা প্রাথমিক স্বস্তি দেয়। নবনির্বাচিত মহিলা প্রধানকে নিয়ে গ্রামের মানুষ বিজয় মিছিল বের করেছে। গলায় মালা পরিয়ে তাঁকে বরণও করা হয়েছে। সকলেই খুব খুশি। মিছিল শেষে স্বামী-স্ত্রী বাড়ি ফিরতেই মহিলা প্রধান স্বামীর হাতে বেদম মার খেয়ে জ্ঞান হারান। কারণ, স্বামী থাকতে তিনি কেন মালাটা পরেছিলেন! সেই মহিলা প্রধানের খোঁজে যখন বাড়িতে লোক আসে, তখন সেই মহিলা প্রধান নিজের অজান্তেই বলে ফেলেন— প্রধান নেই, মাঠে গিয়েছে! নিজে যে নির্বাচিত গ্রামপ্রধান, সেটা ভুলে গিয়ে তাঁর স্বামীকেই তিনি নিজেও প্রধান বলে মনে করেন। কারণ, সেটা না ভুললে তাঁর অস্তিত্বের সঙ্কট।

ঠিক এমন সময়ে আমাদের গ্রামবাংলার মেয়েরা কেমন আছেন— এই প্রশ্নে দৃষ্টি আবছা হয়ে আসে। তবে উত্তরণের গল্পও আছে। সেগুলিই বেশি বেশি করে চর্চা করে মেয়েদের মেরুদণ্ড সোজা করে সরাসরি সংগ্রামে নামার উপযুক্ত করে তুলতে হবে। যাতে ঘরে ও বাইরের এই শোষণ ও শাসন থেকে মুক্ত হয়ে আপন আকাশে নিজের পছন্দমতো ডানা মেলতে পারে নারী। তা না হলে মেয়েদের বা মায়েদের অবস্থা আরও করুণ হবে।

লেখিকা শিক্ষক তথা সমাজকর্মী

আনন্দবাজার পত্রিকা, মূল সংস্করণ, ৮ মার্চ, ২০২০

এই মুহূর্তটাই নারী দিবস

‘‘মেয়ে হয়েছিস তো কী হয়েছে? সব পারবি!’’

স্বাতী ভট্টাচার্য

মেয়েদের জন্য কন্যাশ্রী, সবুজসাথী, কত প্রকল্প। তবু কেন মেয়েরা স্কুল ছাড়ছে? প্রশ্নটা তুলল ক্লাস নাইনের অহনা। উত্তরও বার করেছে ভেবে। মেয়েদের পড়ার শত্রু — ভাল পাত্র। ‘‘ভাল ছেলে পেলেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয়। কেন? কাল আরও ভাল জুটতে পারত।’’ আর এক ছাত্রী সানিয়ার নালিশ, ‘‘আমার এক বন্ধু পড়াশোনায় কত ভাল ছিল। মায়ের মৃত্যুর পর মাতাল বাবা বিয়ে দিয়ে দিল, মেয়েটা আত্মহত্যা করল।’’ বীরভূমের নানা ব্লক থেকে আসা এই মেয়েদের নালিশ, তাদের ইচ্ছে, স্বপ্ন, প্রতিভার গলা টিপে মারা হচ্ছে। এ বছরও অন্তত দু’লক্ষ মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্রগুলো থেকে ‘মিসিং’ ছিল। স্কুলের পড়া শেষ করার আগেই তারা ঝরে গিয়েছে স্কুলশিক্ষা থেকে। ছেলেদের চাইতে বেশি মেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে, এই ধুয়ো তুলে সেই সত্যটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে প্রতি বছর।

বোলপুরে প্রতীচী ট্রাস্টের বার্ষিক সভা এ বার হল নবনীতা দেব সেনের স্মরণে, বিষয় কন্যাদের শিক্ষা। ছাত্রীরা এই প্রথম বলছে মাইকের সামনে, দু’চার কথার পরেই কেটে যাচ্ছে জড়তা। বাক্যগুলো উঠে আসছে যেন বুক থেকে। সামান্য দূরে বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাসে রামকিঙ্করের ভাস্কর্য, সাঁওতাল নারীর আঁচল উড়ছে হাওয়ায়। আর আজকের আদিবাসী কন্যা মাইকে বলছে, ‘‘সাঁওতালদের মধ্যে মেয়েদের সম্মান নেই। সরকার সবই দিচ্ছে, তবু আমার মতো মেয়েদের মাঠের কাজে লাগানো হচ্ছে। বিয়ে দিচ্ছে।’’ সভা-ভর্তি শিক্ষকদের মধ্যে নৈঃশব্দ্য নেমে

আসে যখন এই ‘ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার’ প্রশ্ন করে, ‘‘স্কুলে যা পড়ানো হয়, তার সঙ্গে কি জীবনের কোনও মিল আছে?’’

থাকবে কী করে? মেয়েদের স্বাধিকার, সক্ষমতার পাঠ কি সমাজ গ্রহণ করেছে? স্বয়ং সরকার কি পাত্তা দেয় তাকে? যখন কন্যাশ্রী বাহিনী কিংবা এনজিও কর্মীকে নাবালিকার বিয়ে রুখতে এগিয়ে দিয়ে ওসি থানায় বসে দাঁত খোঁটেন, যখন চাইল্ড হেল্পলাইনে ফোন করলে কর্মীরা দাবি করেন, ‘‘মেয়ের বয়সের সার্টিফিকেট জেরক্স করে পাঠান’’, যখন পঞ্চায়েত প্রধান নাবালিকার বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়ে আসেন, তখন মেয়েরা বুঝে যায়, ‘উৎসাহ’ দিয়ে ওদের উচ্চাশার গাছে তুলে মই কাড়তে হাত কাঁপে না সরকারের। আজ সাইকেল, কাল হেঁশেল, এই অবিচারে মেয়েদের বুক ভেঙে গেলেও নেতা-আধিকারিকদের কিস্যু যায়-আসে না।

কত নগ্ন, নির্লজ্জ পুরুষতন্ত্র কাজ করছে পুলিশ-প্রশাসনে, আন্দাজ হয় এক মাদ্রাসার প্রধানশিক্ষিকার কথায়। মাধ্যমিক পরীক্ষার সকালে কয়েকটি মেয়ে খবর নিয়ে এল, ক্লাস নাইনের এক সহপাঠীর বিয়ে হচ্ছে। পাত্র তারই ভাই। তাই কখনও হয়? শিক্ষিকাকে এক ভয়াবহ গল্প বলল মেয়েরা। পালক পিতার উপর্যুপরি ধর্ষণে মেয়েটি গর্ভবতী, বাড়িরই একটি ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে সব দিক ‘রক্ষা করা’ হচ্ছে। শিক্ষিকা ফোন করলেন পুলিশ, বিডিওকে। নাবালিকার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, এখনই যান। কর্তারা সবাই মাধ্যমিকে ব্যস্ত। অনেক তাগাদার পর ‘খোঁজ’ নিয়ে পুলিশকর্তা ফোন করলেন, ‘আপনি তো আসল ব্যাপারটা জানেন না ম্যাডাম। মেয়েটা প্রেগন্যান্ট।’

হ্যাঁ, এ বছরেরই ঘটনা। না, সে বিয়ে রুখতে কেউ যায়নি পুলিশ-প্রশাসন থেকে। পর দিন স্কুলে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল ধর্ষিতা-বিবাহিতা নাবালিকার বন্ধুরা। প্রধানশিক্ষিকা ওদের জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, ‘‘অপেক্ষা কর। এক দিন তোদের সময় আসবে, সে দিন তোরা বদলাবি দেশকে।’’ উপায় কি? এখন প্রতিবাদ করলে তো এই মেয়েদেরই বাড়ি থেকে বার করে দেবে।

এই হল বই-সাইকেল বিতরণকারী সরকারের মুখ। কন্যাশ্রীর পঁচিশ হাজার টাকা যে মেয়ের বাপ-মা আঠারো বছরে বিয়ের ‘লাইসেন্স’ বলে ধরে নিয়েছে, সরকার কি তা জানে না? বিলক্ষণ জানে, এবং সেই ভুল ধারণা নস্যাৎ করতে কড়ে আঙুলটিও নাড়ে না। মেয়েরাও ধরে নিয়েছে, টাকাটা পণের জন্য। হিঙ্গলগঞ্জের এক প্রধানশিক্ষককে তাঁর ছাত্রীরা প্রশ্ন করেছে, স্যর, ওই টাকায় কি ব্যবসাও করা যায়? হিঙ্গলগঞ্জ কলেজে ভর্তির বছরখানেকের মধ্যে ষাট শতাংশ মেয়ে ‘ড্রপ আউট’ হয়ে যায়। অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে গিয়েছে, আর মেয়েকে পড়িয়ে কী হবে? প্রতীচীর সভায় এক শিক্ষক প্রশ্ন করলেন, শিক্ষার জন্য ‘কন্যাশ্রী’ আর বিয়ের জন্য ‘রূপশ্রী’, এ কি পরস্পরবিরোধী নয়?

মেয়েদের কাছে ‘সক্ষমতা’ মানে, নিজের ইচ্ছেয় বাঁচা। মাথা উঁচু করে, আনন্দে বাঁচা। সরকারের কাছে ‘সক্ষমতা’ মানে, কোনওক্রমে আঠারো পার করে দেওয়া, যাতে নাবালিকা বিয়ে উন্নয়নের সূচক নামিয়ে সরকারকে ঝামেলায় না ফেলে। ‘কন্যাশ্রী’রা অবাক হয়ে দেখে, আঠারো পূর্ণ হওয়ার আগে বাপ-মা জোর করে বিয়ে দিলে যদি বা পুলিশ নালিশ শোনে, আঠারো বছর এক দিন বয়স হলে কানেই তোলে না। বারুইপুরের একটি মেয়ে এক বার এমনই এক সভায় প্রশ্ন করেছিল, ‘‘আঠারো বছর বয়স হলে মেয়েদের কী হয়, বলতে পারেন?’’ পুলিশ-প্রশাসনের কাছে অন্তত তা স্পষ্ট— আঠারো হয়ে গেলে মেয়ের বিয়ে আর তাদের মাথাব্যথা নয়। তখন মেয়ের অনিচ্ছায় বিয়ে

‘ফ্যামিলির ব্যাপার।’ যার ইচ্ছে-অনিচ্ছের দাম নেই, তার জীবনের দাম কী? সভায় দাঁড়িয়ে এক ছাত্রী বলে যাচ্ছিল তার দেখা খুন-আত্মহত্যার ঘটনা— পিসির মেয়ে, পড়শি বন্ধু, গ্রামের দিদি, স্কুলের সহপাঠী। কারও ষোলো, কারও একুশে শেষ হয়েছে জীবন। বছর চোদ্দোর বালিকা চার-পাঁচ মিনিটে চারটি অপমৃত্যুর উল্লেখ করল। এত মৃত্যু তোমরা দেখেছ? পাশে-বসা পঞ্চদশী নিচু গলায় বলল, ‘‘আমিই তো মরতে গিয়েছিলাম।’’ প্রেম জানাজানি হতে ঘরে আটক, মারধর, বিষ খাওয়া। ‘‘বাড়ি, স্কুল, টিউশন, সবাই মনটা ভেঙে দিয়েছিল। শেষে নিজের সঙ্গে নিজেই লড়াই করলাম।’’ এই লড়াই চলছে ঘরে ঘরে।

‘‘স্কুল ক্যাম্পাসে এত ভয়ানক ঘটনা দেখছি। নিজেদের সহ্যশক্তি দেখে নিজেরাই অবাক হই’’, বললেন প্রধানশিক্ষিকা বিদিশা ঘোষ। ‘‘আমরাও যেন বাদবাকি ভারতবর্ষের মতো হয়ে গিয়েছি।’’ বাকি ভারত, যেখানে শহরের একাংশে আগুন জ্বলে, অন্য অংশ অফিস করে। মেয়েদের জীবনে নিত্যই এমন ‘দাঙ্গা-পরিস্থিতি’। যে কারণে দাঙ্গা করাতে হয়, সেই কারণেই বাপ-শ্বশুর, স্বামী-ভাই মেয়েদের পুড়িয়ে দেয়, তাড়িয়ে দেয়। ‘পূর্ণ নাগরিক’ হওয়ার দাবি যেন ওরা না করে। স্কুলে সমান শিক্ষা, রেশনে সমান চাল, নির্বাচনে সমান ভোট দিতে পেয়ে না ভেবে বসে, ওরা সমান। এখানে বাঁচতে হলে চলতে হবে কথা শুনে, মাথা নিচু করে।

‘‘সরকার না চাহি তো দাঙ্গা না হোই।’’ সরকার চাইলে একটা মেয়েরও অনিচ্ছায় বিয়ে হত না, এক জনও পাচারকারী ছাড়া পেত না। যে ব্যবস্থার দ্বারা একই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে একদল ছেলে দিনের পর দিন ছাত্রীদের বিরক্ত করতে পারে, কেউ তাদের নিরস্ত করে না, বরং মেয়েরাই অপমান-নির্যাতনের ভয়ে স্কুল-কোচিং-টিউশন ছেড়ে দেয়, এ দেশে তার নাম ‘আইনশৃঙ্খলা’। নির্যাতনের মাধ্যমে আধিপত্য কায়েম করার ‘সিস্টেম’ রাষ্ট্র ছাড়া কাজ করতে পারে না। শিক্ষকেরা তা বোঝেন বলেই অনেকে স্কুলে ‘মেয়ে’ হওয়ার পাঠ পড়াতে চান— এমন জামা পরবে না যাতে ছেলেরা তাকায়। নো মোবাইল, নো প্রেম। হিংসা এড়ানোর ‘শিক্ষা’ দেন। এঁরাই সংখ্যায় বেশি। অল্প ক’জন মনে করেন, হিংসাকে পরাহত করে বাঁচার কৌশল রপ্ত করাই ‘শিক্ষা’। এক শিক্ষিকার আক্ষেপ, ‘‘স্কুলে কম্পিউটার শিখিয়ে কী হবে, ক্যারাটে শেখালে কাজ হত।’’

যা কিছু শেখানোর, স্কুলেই শেখাতে হবে। হিংসার অবিরল বর্ষণে গিরি গোবর্ধনের মতো, মেয়েদের ওই একটি আশ্রয়। এক তরুণী সভায় বললেন, পাঁচ বছর বয়সে পরিবারে নিষ্ঠুর যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তিনি। স্কুলের এক দিদিমণিই তাকে ডেকে বলেন, ‘‘তুই চুপচাপ কেন?’’ সহৃদয় ব্যবহারে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনেন শিক্ষিকারা। ‘‘আজ এখানে দাঁড়িয়ে আছি আমার টিচারদের জন্য।’’ সভায় নানা বক্তার কথায় এল সেই মেয়েদের কথা, যারা বাড়ি পালিয়ে স্কুলে আসে পাচার হয়ে উদ্ধার-হওয়া মেয়ে, বিয়ের পর বিতাড়িত মেয়ে, প্রেমে ঘা খেয়ে দিশাহারা মেয়ে, বিয়ে করার চাপের সঙ্গে লড়াইরত মেয়ে, অন্তহীন গৃহকাজ-বন্দি মেয়ে। স্কুলকে জড়িয়ে ওরা উঠে দাঁড়াতে চায়। সেখানেও যারা ‘ছি ছি দূর দূর’ শুনছে, সেই মেয়েরা হারিয়ে যাচ্ছে।

শত ত্রুটি, সহস্র অভাব, নেতার রক্তচক্ষু, জেলা অফিসের হুমকি সত্ত্বেও সরকারি স্কুলের একটি মর্যাদা রয়েছে, যা কেউ সহসা অতিক্রম করতে পারে না। ওইটুকু অবলম্বন করে গ্রাম-মফস্সলের কিছু সরকারি স্কুল অতিক্রম করছে সরকারকে। স্যর-দিদিমণি ছাত্রীকে বলছেন, ‘‘মেয়ে হয়েছিস তো কী হয়েছে? সব পারবি!’’ সেই মুহূর্তটাই নারী দিবস।